সোজন বাদিয়ার ঘাট

জসীম উদ্দীন

সূচিপত্র

নমুদের কালো মেয়ে 2

নীড়.....4

পলায়ন.....12

পুর্ব্বরাগ.....30

বেদের বহর.....39

বেদের বেসাতি.....44

নমুদের কালো মেয়ে

ইতল বেতল ফুলের বনে ফুল ঝুর ঝুর করেরে ভাই।
ফুল ঝুর ঝুর করে ;
দেখে এলাম কালো মেয়ে গদাই নমুর ঘরে।
ধানের আগায় ধানের ছড়া, তাহার পরে টিয়া,
নমুর মেয়ে গা মাজে রোজ তারির পাখা দিয়া,
দুর্বাবনে রাখলে তারে দুর্বাতে যায় মিশে,
মেঘের খাটে শুইয়ে দিলে খুঁজে না পাই দিশে।
লাউয়ের ডগায় লাউয়ের পাতা, রৌদ্রেতে যায় উনে,
গা-ভরা তার সোহাগ দোলে তারির লতা বুনে।
যে পথ দিয়ে যায় চলে সে, যে পথ দিয়ে আসে,
সে পথ দিয়ে মেঘ চলে যায়, বিজলী বরণ হাসে।
বনের মাঝে বনের লতা, পাতায় পাতায় ফুল,
সেও জানে না নমু মেয়ের শ্যামল শোভার তুল।
যে মেঘের জড়িয়ে ধরে হাসে রামের ধনু,
রঙিন শাড়ী হাসে যে তার জড়িয়ে সেই তনু।

গায়ে তাহার গয়না নাহি, হাতে কাচের চুড়ি;
দুই পায়েতে কাঁসার খাড়ু, বাজছে ঘুরি ঘুরি।
এতেই তারে মানিয়েছে যা তুলনা নেই তার;

যে দেখে সে অমনি বলে, দেখে লই আরবার।
সোনা রুপার গয়না তাহার পরিয়ে দিলে গায়,
বাড়ত না রুপ, অপমানই করতে হত তায়।
ছিপছিপে তার পাতলা গঠন, হাত চোখ মুখ কান,
দুলছে হেলছে মেলছে গায়ে গয়না শতখান ।

হ্যাচড়া পুজোর ছড়ার মত ফুরফুরিয়ে ঘোরে
হেথায় হোথায় যথায় তথায় মনের খুশীর ভরে।
বেথুল তুলে, ফুল কুড়িয়ে, বেঙ্গে ফলের ডাল,
সারাটি গাঁও টহল দিয়ে কাটে তাহার কাল।
পুুতুল আছে অনেকগুলো, বিয়ের গাহি গান,
নিমন্ত্রণে লোক ডাকি সে হয় যে লবেজান।
এসব কাজে সোজন তাহার সবার চেয়ে সেরা,
ছমির শেখের ভাজন বেটা, বাবরি মাথায় ঘেরা।
কোন বনেতে কটার বাসার বাড়ছে ছোট ছানা,
ডাহুক কোথায় ডিম পাড়ে তার নখের আগায় জানা।
সবার সেরা আমের আঁটির গড়তে জানে বাঁশী,
উঁচু ডালে পাকা কুলটি পাড়তে পারে হাসি।
বাঁশের পাতায় নথ গড়ায়ে গাবের গাঁথি হার,
অনেক কালই জয় করেছে শিশু মনটি তার।

নীড়

গড়াই নদীর তীরে,
কুটিরখানিরে লতা-পাতা-ফুল মায়ায় রয়েছে ঘিরে।
বাতাসে হেলিয়া, আলোতে খেলিয়া সন্ধ্যা সকালে ফুটি,
উঠানের কোণে বুনো ফুলগুলি হেসে হয় কুটি কুটি।
মাচানের পরে সীম-লতা আর লাউ কুমড়ার ঝাড়,
আড়া-আড়ি করি দোলায় দোলায় ফুল ফল যত যার।
তল দিয়ে তার লাল নটেশাক মেলিছে রঙের ঢেউ,
লাল শাড়ীখানি রোদ দিয়ে গেছে এ বাড়ির বধূ কেউ।
মাঝে মাঝে সেথা এঁদো ডোবা হতে ছোট ছোট ছানা লয়ে,
ডাহুক মেয়েরা বেড়াইতে আসে গানে গানে কথা কয়ে!
গাছের শাখায় বনের পাখিরা নির্ভয়ে গান ধরে,
এখনো তাহারা বোঝেনি হেথায় মানুষ বসত করে।

মটরের ডাল, মসুরের ডাল, কালিজিড়া আর ধনে,
লঙ্কা-মরিচ রোদে শুখাইছে উঠানেতে সযতনে।
লঙ্কার রঙ মসুরের রঙ, মটরের রঙ আর,
জিড়া ও ধনের রঙের পাশেতে আলপনা আঁকা কার।
যেন একখানি সুখের কাহিনী নানান আখরে ভরি,
এ বাড়ির যত আনন্দ হাসি আঁকা জীবন- করি।

সাঁঝ সকালের রঙিন মেঘেরা এখানে বেড়াতে এসে,
কিছুখন যেন থামিয়া রয়েছে এ বাড়িরে ভালবেসে।
সামনে তাহার ছোট ঘরখানি ময়ূর পাখির মত,
চালার দুখানা পাখনা মেলিয়া তারি ধ্যানে আছে রত।
কুটিরখানির একধারে বন, শ্যাম-ঘন ছায়াতলে,
মহা-রহস্য লুকাইয়া বুকে সাজিছে নানান ছলে।
বনের দেবতা মানুষের ভয়ে ছাড়ি ভূমি সমতল,
সেথায় মেলিছে অতি চুপি চুটি সৃষ্টির কৌশল;
লতা-পাতা ফুল ফলের ভাষায় পাখিদের বুনো সুরে।
তারি বুকখানি সারা বন বেড়ি ফিরিতেছে সদা ঘুরে।
ইহার পাশেতে ছোট গেহ-খনি, এ বনের বন-রাণী,
বনের খেলায় হয়রান হয়ে শিথিল বসনখানি;
ইহার ছায়ায় মেলিয়া ধরিয়া শুয়ে ঘুম যাবে বলে,
মনের মতন করিয়া ইহারে গড়িয়াছে নানা ছলে।

সে ঘরের মাঝে দুটি পা মেলিয়া বসিয়া একটি মেয়ে ,
পিছনে তাহার কালো চুলগুলি মাটিতে পড়েছে বেয়ে।
দুটি হাতে ধরি রঙিন শিকায় রচনা করিছে ফুল,
বাতাসে সরিয়া মুখে উড়িতেছে কভু দু একটি চুল।
কুপিত হইয়া চুলেরে সরাতে ছিড়িছে হাতের সূতো,
চোখ ঘুরাইয়া সুতোরে শাসায় করিয়া রাগের ছুতো।

তারপর শেষে আপনার মনে আপনি উঠিছে হাসি,
আরো সরু সরু ফুল ফুটিতেছে শিকার জালেতে আসি।
কালো মুখখানি, বন-লতা পাতা আদর করিয়া তায়,
তাহাদের গার যত রঙ যেন মেখেছে তাহার গায়।
বনের দুলালী ভাবিয়া ভাবিয়া বনের শ্যামল কায়া;
জানে না, কখন ছড়ায়েছে তার অঙ্গে বনের ছায়া।
আপনার মনে শিকা বুনাইছে, ঘরের দুখানা চাল,
দুখানা রঙিন ডানায় তাহারে করিয়াছে আবডাল।
আটনের গায়ে সুন্দীবেতের হইয়াছে কারুকাজ
বাজারের সাথে পরদা বাঁধন মেলে প্রজাপতি সাজ।
ফুস্যির সাথে রাঙতা জড়ায়ে গোখুরা বাঁধনে আঁটি,
উলু ছোন দিয়ে ছাইয়াছে ঘর বিছায়ে শীতল পাটি।
মাঝে মাঝে আছে তারকা বাঁধন, তারার মতন জ্বলে,
রুয়ার গোড়ায় খুব ধরে ধরে ফুলকাটা শতদলে।
তারি গায় গায় সিদুরের গুড়ো, হলুদের গুড়ো দিয়ে,
এমনি করিয়া রাঙায়েছে যেন ফুলেরা উঠেছে জিয়ে।
একপাশে আশে ফুলচাং ভাল বলা যায়নাক ত্বরা।
তার সাথে বাঁধা কেলী কদম্ব ফুল-ঝুরি শিকা আর,
আসমান-তারা শিকার রঙেতে সব রঙ মানে হার।
শিকায় ঝুলানো চিনের বাসন, নানান রঙের শিশি,
বাতাসের সাথে হেলিছে দুলিছে রঙে রঙে দিবানিশি।

তাহার নীচেতে মাদুর বিছায়ে মেয়েটি বসিয়া একা,
রঙিন শিকার বাঁধনে বাঁধনে রচিছে ফুলের লেখা।

মাথার উপরে আটনে ছাটনে বেতের নানান কাজ,
ফুলচাং আর শিকাগুলি ভরি দুলিতেছে নানা সাজ।
বনের শাখায় পাখিদের গান, উঠানে লতার ঝাড়
সবগুলো মিলে নির্জ্জনে যেন মহিমা রচিছে তার।
মেয়েটি কিন্তু জানে না এ সব, শিকায় তুলিছে ফুল,
অতি মিহি সুরে গান সে গাহিছে মাঝে মাঝে করি ভুল।
বিদেশী তাহার স্বামীর সহিত গভীর রাতের কালে,
পাশা খেলাইতে ভানুর নয়ন জড়াল ঘুমের জালে।

ঘুমের ঢুলুনী, ঘুমের ভুলুনী-সকালে ধরিয়া তায়,
পাল্কীর মাঝে বসাইয়া দিয়া পাঠাল স্বামীর গাঁয়।
ঘুমে ঢুলু আঁখি, পাল্কী দোলায় চৈতন হল তার,
চৈতন হয়ে দেখে সে ত আজ নহে কাছে বাপ-মার।
এত দরদের মা-ধন ভানুর কোথায় রহিল হায়,
মহিষ মানত করিত তাহার কাঁটা যে ফুটিলে পায়।
হাতের কাঁকনে আঁচড় লাগিলে যেত যে সোনারু বাড়ি,
এমন বাপেরে কোন দেশে ভানু আসিয়াছে আজ ছাড়ি।
কোথা সোহাগের ভাই-বউ তার মেহেদী মুছিলে হায়,

সাপন সীথার সিদুর লইত ঘষিতে ভানুর পায়।
কোথা আদরের মৈফল-ভাই ভানুর আঁচল ছাড়ি,
কি করে আজিকে দিবস কাটিছে একা খেলাঘরে তারি।

এমনি করিয়া বিনায়ে বিনায়ে মেয়েটি করিছে গান,
দূরে বন পথে বউ কথা কও পাখি ডেকে হয়রান।
সেই ডাক আরো নিকটে আসিল, পাশের ধঞ্চে-খেতে
তারপর এলো তেঁতুলতলায় কুটিরের কিনারেতে
মেয়েটি খানিক শিকা তোলা রাখি অধরেতে হাসি আঁকি,
পাখিটিরে সে যে রাগাইয়া দিল বউ কথা কও ডাকি।
তারপর শেষে আগের মতই শিকায় বসাল মন,
ঘরের বেড়ার অতি কাছাকাছি পাখি ডাকে ঘন ঘন।
এবার সে হল আরও মনোযোগী, শিকা তোলা ছাড়া আর,
তার কাছে আজ লোপ পেয়ে গেছে সব কিছু দুনিয়ার।
দোরের নিকট ডাকিল এবার বউ কথা কও পাখি,
বউ কথা কও, বউ কথা কও, বারেক ফিরাও আঁখি।
বউ মিটি মিটি হাসে আর তার শিকায় যে ফুল তোলে,
মুখপোড়া পাখি এবার তাহার কানে কানে কথা বলে।
যাও ছাড়-লাগে, এবার বুঝিনু বউ তবে কথা কয়,
আমি ভেবেছিনু সব বউ বুঝি পাখির মতন হয়।
হয়ত এমনি পাখির মতন এ ডাল ও ডাল করি,

বই কথা কও ডাকিয়া ডাকিয়া জনম যাইবে হরি,
হতভাগা পাখি! সাধিয়া সাধিয়া কাঁদিয়া পাবে না কূল,
মুখপোড়া বউ সারাদিন বসি শিকায় তুলিবে ফুল।
ইস্যিরে মোর কথার নাগর! বলি ও কি করা হয়,
এখনি আবার কুঠার নিলে যে, বসিতে মন না লয়?
তুমি এইবার ভাত বাড় মোর, একটু খানিক পরে,
চেলা কাঠগুলো ফাঁড়িয়া এখনি আসিতেছি ঝট করে।

কখনো হবে না, আগে তুমি বস, বউটি তখন উঠি,
ডালায় করিয়া হুড়ুমের মোয়া লইয়া আসিল ছুটি।
একপাশে দিল তিলের পাটালী নারিকেল লাড়ু আর
ফুল লতা আঁকা ক্ষীরের তক্তি দিল তারে খাইবার।
কাঁসার গেলাসে ভরে দিল জল, মাজা ঘষা ফুরফুরে
ঘরের যা কিছু মুখ দেখে বুঝি তার মাঝে ছায়া পূরে।
হাতেতে লইয়া ময়ূরের পাখা বউটি বসিল পাশে,
বলিল, এসব সাজায়ে রাখিনু কোন দেবতার আশে?
তুমিও এসো না! হিন্দুর মেয়ে মুসলমানের সনে
খাইতে বসিয়া জাত খোয়াইব তাই ভাবিয়াছ মনে?
নিজেরই জাতিটা খোয়াই তাহলেবড় গম্ভীর হয়ে,
টপটপ করে যা ছিল সোজন পুরিল অধরালয়ে।

বউ ততখনে কলিকার পরে ঘন ঘন ফুঁক পাড়ি,
ফুলকি আগুন ছড়াইতেছিল দুটি ঠোট গোলকরি।
দুএক টুকরো ওড়া ছাই এসে লাগছিল চোখে মুখে,
ঘটছিল সেথা রূপান্তর যে বুঝি না দুখে কি সুখে।
ফুঁক দিতে দিতে দুটি গাল তার উঠছিল ফুলে ফুলে,
ছেলেটি সেদিকে চেয়ে চেয়ে তার হাত ধোয়া গেল ভুলে।
মেয়ে এবার টের পেয়ে গেছে, কলকে মাটিতে রাখি,
ফিরিয়া বসিল ছেলেটির পানে ঘুরায়ে দুইটি আঁখি।

তারপর শেষে শিকা হাতে লয়ে বুনাতে বসিল ত্বরা,
মেলি বাম পাশে দুটি পাও তাতে মেহেদীর রঙ ভরা।
নীলাম্বরীর নীল সায়রেতে রক্ত কমল দুটি,
প্রথমভোরের বাতাস পাইয়া এখনি উঠিছে ফুটি।
ছেলেটি সেদিক অনিমেষ চেয়ে, মেয়েটি পাইয়া টের,
শাড়ীর আঁচলে চরণ দুইটি ঢাকিয়া লইল ফের।

ছেলেটি এবার ব্যস্ত হইয়া কুঠার লইল করে,
এখনি সে যেন ছুটিয়া যাইবে চেলা ফাড়িবার তরে।
বউটি তখন পার আবরণ একটু লইল খুলি,
কি যেন খুঁজিতে ছেলেটি আসিয়া বসিল আবার ভুলি।
এবার বউটি ঢাকিল দুপাও শাড়ীর আঁচল দিয়ে,

ছেলেটি সজোরে কলকে রাখিয়া টানিল হুকোটি নিয়ে।
খালি দিনরাত শিকা ভাঙাইবে? হুকোয় ভরেছ জল?
কটার মতন গন্ধ ইহার একেবারে অবিকল।
এক্ষুণি জল ভরিণু হুকায়। দেখ! রাগায়ো না মোরে,
নৈচা আজিকে শিক পুড়াইয়া দিয়েছিলে সাফ করে?
কটর কটর শব্দ না যেন মুন্ড হতেছে মোর,
রান্নাঘরেতে কেন এ দুপুরে দিয়ে দাও নাই দোর?
এখনি খুলিলে? কথায় কথায় কথা কর কাটাকাটি,
রাগি যদি তবে টের পেয়ে যাবে বলিয়া দিলাম খাঁটি!

মিছেমিছি যদি রাগিতেই সখ, বেশ রাগ কর তবে,
আমার কি তাতে, তোমারি চক্ষু রক্ত বরণ হবে।
রাগিবই তবে? আচ্ছা দাঁড়াও মজাটা দেখিয়া লও,
যখন তখন ইচ্ছা মাফিক যা খুশী আমারে কও!
এইবার দেখ! না! না! তবে আর রাগিয়া কি মোর হবে,
আমি ত তোমার কেউ কেটা নই খবর টবার লবে?

বউটি বসিয়াশিকা ভাঙাইতেছে, আর হাসিতেছে খালি,
প্রতিদিন সে ত বহুবার শোনে এমনি মিষ্ট গালি।

পলায়ন

নমুর পাড়ায় বিবাহের গানে আকাশ বাতাস
উঠিয়াছে আজি ভরি,
থাকিয়া থাকিয়া হইতেছে উলু, ঢোল ও সানাই
বাজিতেছে গলা ধরি।
রামের আজিকে বিবাহ হইবে, রামের মায়ের
নাহি অবসর মোটে;
সোনার বরণ সীতারে বরিতে কোনখানে আজ
দূর্বা ত নাহি জোটে।
কোথায় রহিল সোনার ময়ূর, গগনের পথে
যাওরে উড়াল দিয়া,
মালঞ্চঘেরা মালিনীর বাগ হইতে গো তুমি
দূর্বা যে আনো গিয়া।

এমনি করিয়া গেঁয়ো মেয়েদের করুণ সুরের
গানের লহরী পরে,
কত সীতা আর রাম লক্ষণ বিবাহ করিল
দূর অতীতের ঘরে।
কেউ বা সাজায় বিয়েরে কনেরে, কেউ রাঁধে রাড়ে
ব্যস্ত হইয়া বড়,

গদাই নমুর বাড়িখানি যেন ছেলেমেয়েদের
কলরবে নড় নড়।
দূর গাঁর পাশে বনের কিনারে দুজন কাহারা
ফিস্ ফিস্ কথা কয়!
বিবাহ বাড়ির এত সমারোহ সেদিকে কাহারো
ভ্রক্ষেপ নাহি হায়!

সোজন, আমার বিবাহ আজিকে, এই দেখ আমি
হলুদে করিয়া স্নান,
লাল-চেলী আর শাঁখা সিন্দুর আলতার রাগে
সাজিয়েছি দেহখান।
তোমারে আজিকে ডাকিয়াছি কেন, নিকটে আসিয়া
শুন তবে কান পাতি,
এই সাজে আজ বাহির যেথা যায় আঁখি,
তুমি হবে মোর সাথী।

কি কথা শুনালে অবুঝ! এখনো ভাল ও মন্দ
বুঝিতে পারনি হায়,
কাঞ্চাবাঁশের কঞ্চিরে আজি যেদিকে বাঁকাও
সেদিকে বাঁকিয়ে যায়।

আমার জীবনে শিশুকাল হতে তোমারে ছাড়িয়া
বুঝি নাই আর কারে,
আমরা দুজনে একসাথে রব, এই কথা তুমি
বলিয়াছ বারে বারে।
এক বোঁটে মোরা দুটি ফুল ছিনু একটিরে তার
ছিঁড়ে নেয় আর জনে;
সে ফুলেরে তুমি কাড়িয়া লবে না? কোন কথা আজ
কহে না তোমার মনে?
ভাবিবার আর অবসর নাহি, বনের আঁধারে
মিশিয়াছে পথখানি,
দুটি হাত ধরে সেই পথে আজ, যত জোরে পার
মোরে নিয়ে চল টানি।
এখনি আমারে খুঁজিতে বাহির হইবে ক্ষিপ্ত
যত না নমুর পাল,
তার আগে মোরা বন ছাড়াইয়া পার হয়ে যাব
কুমার নদীর খাল।
সেথা আছে ঘোর অতসীর বন, পাতায় পাতায়
ঢাকা তার পথগুলি,
তারি মাঝ দিয়া চলে যাব মোরা, সাধ্য কাহার
সে পথের দেখে ধুলি।

হায় দুলী! তুমি এখনো অবুঝ, বুদ্ধি-সুদ্ধি
কখন বা হবে হায়,
এ পথের কিবা পরিণাম তুমি ভাবিয়া আজিকে
দেখিয়াছ কভু তায়?
আজ হোক কিবা কাল হোক, মোরা ধরা পড়ে যাব
যে কোন অশুভক্ষণে,
তখন মোদের কি হবে উপায়, এই সব তুমি
ভেবে কি দেখেছ মনে?
তোমারে লইয়া উধাও হইব, তারপর যবে
ক্ষিপ্ত নমুর দল,
মোর গাঁয়ে যেয়ে লাফায়ে পড়িবে দাদ নিতে এর
লইয়া পশুর বল;
তখন তাদের কি হবে উপায়? অসহায় তারা
না না, তুমি ফিরে যাও!
যদি ভালবাস, লক্ষ্মী মেয়েটি, মোর কথা রাখ,
নয় মোর মাথা খাও।

নিজেরি স্বার্থ দেখিলে সোজন, তোমার গেরামে
ভাইবন্ধুরা আছে,
তাদের কি হবে! তোমার কি হবে! মোর কথা তুমি
ভেবে না দেখিলে পাছে?

এই ছিল মনে, তবে কেন মোর শিশুকালখানি
তোমার কাহিনী দিয়া,
এমন করিয়া জড়াইয়াছিলে ঘটনার পর
ঘটনারে উলটিয়া?
আমার জীবনে তোমারে ছাড়িয়া কিছু ভাবিবারে
অবসর জুটে নাই,
আজকে তোমারে জনমের মত ছাড়িয়া হেথায়
কি করে যে আমি যাই!
তোমার তরুতে আমি ছিনু লতা, শাখা দোলাইয়া
বাতাস করেছ যারে,
আজি কোন প্রাণে বিগানার দেশে, বিগানার হাতে
বনবাস দিবে তারে?
শিশুকাল হতে যত কথা তুমি সন্ধ্যা সকালে
শুনায়েছ মোর কানে,
তারা ফুল হয়ে, তারা ফল হয়ে পরাণ লতারে
জড়ায়েছে তোমা পানে।
আজি সে কথারে কি করিয়া ভুলি? সোজন! সোজন!
মানুষ পাষাণ নয়!
পাষাণ হইলে আঘাতে ফাটিয়া চৌচির হত
পরাণ কি তাহা হয়?
ছাঁচিপান দিয়ে ঠোঁটেরে রাঙালে, তখনি তা মোছে

ঠোঁটেরি হাসির ঘায়,
কথার লেখা যে মেহেদির দাগ-যত মুছি তাহা
তত ভাল পড়া যায়।
নিজেরি স্বার্থ দেখিলে আজিকে, বুঝিলে না এই
অসহায় বালিকার,
দীর্ঘজীবন কি করে কাটিবে তাহারি সঙ্গে,
কিছু নাহি জানি যার।
মন সে ত নহে কুমড়ার ফালি, যাহারে তাহারে
কাটিয়া বিলান যায়,
তোমারে যা দেছি, অপরে ত যবে জোর করে চাবে
কি হবে উপায় হায়!
জানি, আজি জানি আমারে ছাড়িতে তোমার মনেতে
জাগিবে কতেক ব্যথা,
তবু সে ব্যথারে সহিওগো তুমি, শেষ এ মিনতি,
করিও না অন্যথা।
আমার মনেতে আশ্বাস রবে, একদিন তুমি
ভুলিতে পারিবে মোরে,
সেই দিন যেন দূরে নাহি রয়, এ আশিস আমি,
করে যাই বুক ভরে।
এইখানে মোরা দুইজনে মিলি গাড়িয়াছিলাম
বটপাকুড়ের চারা,

নতুন পাতার লহর মেলিয়া, এ ওরে ধরিয়া
বাতাসে দুলিছে তারা!
সরু ঘট ভরি জল এনে মোরা প্রতি সন্ধ্যায়
ঢালিয়া এদের গোড়ে
আমাদের ভালবাসারে আমরা দেখিতে পেতাম
ইহাদের শাখা পরে।
সামনে দাঁড়ায়ে মাগিতাম বর-এদেরি মতন
যেন এ জীবন দুটি,
শাখায় জড়ায়ে, পাতায় জড়ায়ে এ ওরে লইয়া
সামনেতে যায় ছুটি।
এ গাছের আর কোন প্রয়োজন? এসো দুইজনে
ফেলে যাই উপাড়িয়া,
নতুবা ইহারা আর কোনো দিনে এই সব কথা
দিবে মনে করাইয়া।
ওইখানে মোরা কদমের ডাল টানিয়া বাঁধিয়া
আম্রশাখার সনে,
দুইজনে বসি ঠিক করিতাম, কেবা হবে রব,
কেবা হবে তার কনে।
আম্রশাখার মুকুল হইলে, কদম গাছেরে
করিয়া তাহার বর,
মহাসমারোহে বিবাহ দিতাম মোরা দুইজনে

সারাটি দিবসভর।
আবার যখন মেঘলার দিনে কদম্ব শাখা
হাসিত ফুলের ভারে,
কত গান গেয়ে বিবাহ দিতাম আমের গাছের
নববধূ করি তারে।
বরণের ডালা মাথায় করিয়া পথে পথে ঘুরে
মিহি সুরে গান গেয়ে
তুমি যেতে যবে তাহাদের কাছে, আঁচল তোমার
লুটাত জমিন ছেয়ে।

দুইজনে মিলে কহিতাম, যদি মোদের জীবন
দুই দিকে যেতে চায়,
বাহুর বাঁধন বাঁধিয়া রাখিব, যেমনি আমরা
বেঁধেছি এ দুজনায়।
আজিকে দুলালী, বাহুর বাঁধন হইল যদিবা
স্বেচ্ছায় খুলে দিতে,
এদেরো বাঁধন খুলে দেই, যেন এই সব কথা
কভু নাহি আনে চিতে।
সোজন! সোজন! তার আগে তুমি, যে লতার বাঁধ
ছিঁড়িলে আজিকে হাসি,
এই তরুতলে, সেই লতা দিয়ে আমারো গলায়

পরাইয়ে যাও ফাঁসি।
কালকে যখন আমার খবর শুধাবে সবারে
হতভাগা বাপ-মায়,
কহিও তাদের, গহন বনের নিদারুণ বাঘে
ধরিয়া খেয়েছে তায়।
যেই হাতে তুমি উপাড়ি ফেলিবে শিশু বয়সের
বট-পাকুড়ের চারা,
সেই হাতে এসো ছুরি দিয়ে তুমি আমারো গলায়
ছুটাও লহুর ধারা।
কালকে যখন গাঁয়ের লোকেরা হতভাগিনীর
পুছিবে খবর এসে,
কহিও, দারুণ সাপের কামড়ে মরিয়াছে সে যে
গভীর বনের দেশে।
কহিও অভাগী ঝালী না বিষের লাড়ু বানাইয়া
খাইয়াছে নিজ হাতে;
আপনার ভরা ডুবায়েছে সে যে অথই গভীর
কূলহীন দরিয়াতে।

ছোট বয়সের সেই দুলী তুমি এত কথা আজ
শিখিয়াছ বলিবারে,
হায় আমি কেন সায়রে ভাসানু দেবতার ফুল-

সরলা এ বালিকারে!
আমি জানিতাম, তোমার লাগিয়া তুষের অনলে
দহিবে আমারি হিয়া,
এ পোড়া প্রেমের সকল যাতনা নিয়ে যাব আমি
মোর বুকে জ্বালাইয়া।
এ মোর কপাল শুধু ত পোড়েনি তোমারো আঁচলে
লেগেছে আগুন তার;
হায় অভাগিনী, এর হাত হতে এ জনমে তব
নাহি আর নিস্তার!
তবু যদি পার মোরে ক্ষমা কোরো, তোমার ব্যথার
আমি একা অপরাধী;
সব তার আমি পূরণ করিব, রোজ কেয়ামতে
দাঁড়াইও হয়ে বাদী।
আজকে আমারে ক্ষমা করে যাও, সুদীর্ঘ এই
জীবনের পরপারে-
সুদীর্ঘ পথে বয়ে নিয়ে যেয়ো আপন বুকের
বেবুঝ এ বেদনাবে।

সেদিন দেখিবে হাসিয়া সোজন খর দোজখের
আতসের বাসখানি,
গায়ে জড়াইয়া অগ্নির যত তীব্র দাহন

বক্ষে লইবে টানি।
আজিকে আমরে ক্ষমা করে যাও, আগে বুঝি নাই
নিজেরে বাঁধিতে হায়,
তোমার লতারে জড়ায়েছি আমি, শাখা বাহুহীন
শুকনো তরুন গায়।
কে আমারে আজ বলে দিবে দুলী, কি করিলে আমি
আপনারে সাথে নিয়ে,
এ পরিণামের সকল বেদনা নিয়ে যেতে পারি
কারে নাহি ভাগ দিয়ে।
ওই শুন, দূরে ওঠে কোলাহল, নমুরা সকলে
আসিছে এদিন পানে,
হয়ত এখনি আমাদের তারা দেখিতে পাইবে
এইভাবে এইখানে।

সোজন! সোজন! তোমরা পুরুষ, তোমারে দেখিয়া
কেউ নাহি কিছু কবে,
ভাবিয়া দেখেছ, এইভাবে যদি তারা মোরে পায়,
কিবা পরিণাম হবে?
তোমরা পুরুষ-সমুখে পিছনে যে দিকেই যাও,
চারিদেকে খোলা পথ,
আমরা যে নারী, সমুখ ছাড়িয়া যেদিকেতে যাব,

বাধাঘেরা পর্ব্বত।
তুমি যাবে যাও, বারণ করিতে আজিকার দিনে
সাধ্য আমার নাই,
মোরে দিয়ে গেলে কলঙ্কভার, মোর পথে যেন
আমি তা বহিয়া যাই,
তুমি যাবে যাও, আজিকার দিনে এই কথাগুলি
শুনে যাও শুধু কানে,
জীবনের যত ফুল নিয়ে গেলে, কন্টক তরু
বাড়ায়ে আমার পানে।
বিবাহের বধূ পালায়ে এসেছি, নমুরা আসিয়া
এখনি খুঁজিয়া পাবে,
তারপর তারা আমারে ঘিরিয়া অনেক কাহিনী
রটাবে নানানভাবে।
মোর জীবনের সুদীর্ঘ দিনে সেই সব কথা
চোরকাঁটা হয়ে হায়,
উঠিতে বসিতে পলে পলে আসি নব নবরূপে
জড়াবে সারাটি গায়।
তবু তুমি যাও, আমি নিয়ে গেনু এ পরিনামের
যত গাঁথা ফুল-মালা।
ক্ষমা কর তুমি, ক্ষমা কর মোরে, আকাশ সায়রে
তোমার চাঁদের গায়,

আমি এসেছিনু, মোর জীবনের যত কলঙ্ক
মাখাইয়া দিতে হায়!
সে পাপের যত শাসি-রে আমি আপনার হাতে
নীরবে বহিয়া যাই,
আজ হতে তুমি মনেতে ভাবিও, দুলী বলে পথে
কারে কভু দেখ নাই।

সোঁতের শেহলা, ভেসে চলে যাই, দেখা হয়েছিল
তোমার নদীর কূলে,
জীবনেতে আছে বহুসুখ হাসি, তার মাঝে তুমি
সে কথা যাইও ভুলে।
যাইবার কালে জনমের মত শেষ পদধূলি
লয়ে যাই তবে শিরে,
আশিস্ করিও, সেই ধূলি যেন শত ব্যথা মাঝে
রহে অভাগীরে ঘিরে।
সাক্ষী থাকিও দরদের মাতা, সাক্ষী থাকিও
হে বনের গাছপালা-
সোজন আমার প্রাণের সোয়ামী, সোজন আমার
গলার ফুলের মালা।
সাক্ষী থাকিও চন্দ্র-সূর্য, সাক্ষী থাকিও-
আকাশের যত তারা,

ইহকালে আর পরকালে মোর কেহ কোথা নাই,
কেবল সোজন ছাড়া।
সাক্ষী থাকিও গলার এ হার, সাক্ষী থাকিও
বাপ-ভাই যতজন
সোজন আমার পরাণের পতি, সোজন আমার
মনের অধিক মন।
সাক্ষী থাকিও সীথার সিদুর, সাক্ষী থাকিও
হাতের দুগাছি শাঁখা,
সোজনের কাছ হইতে পেলাম এ জনমে আমি
সব চেয়ে বড় দাগা।

দুলী! দুলী! তবে ফিরে এসো তুমি, চল দুইজনে
যেদিকে চরণ যায়,
আপন কপাল আপনার হাতে যে ভাঙিতে চাহে,
কে পারে ফিরাতে তায়।
ভেবে না দেখিলে, মোর সাথে গেলে কত দুখ তুমি
পাইবে জনম ভরি,
পথে পথে আছে কত কন্টক, পায়েতে বিঁধিবে
তোমারে আঘাত করি।
দুপুরে জ্বলিবে ভানুর কিরণ, উনিয়া যাইবে
তোমার সোনার লতা,

ক্ষুধার সময়ে অন্ন অভাবে কমল বরণ
মুখে সরিবে না কথা।
রাতের বেলায় গহন বনেতে পাতার শয়নে
যখন ঘুমায়ে রবে,
শিয়রে শোসাবে কাল অজগর, ব্যাঘ্র ডাকিবে
পাশেতে ভীষণ রবে।
পথেতে চলিতে বেতের শীষায় আঁচল জড়াবে,
ছিঁড়িবে গায়ের চাম,
সোনার অঙ্গ কাটিয়া কাটিয়া ঝরিয়া পড়িবে
লহুধারা অবিরাম।

সেদিন তোমার এই পথ হতে ফিরিয়া আসিতে
সাধ হবে না আর,
এই পথে যার এক পাও চলে, তারা চলে যায়
লক্ষ যোজন পার।
এত আদরের বাপ-মা সেদিন বেগানা হইবে
মহা-শত্রুর চেয়ে,
আপনার জন তোমারে বধিতে যেখানে সেখানে
ফিরিবে সদাই ধেয়ে।
সাপের বাঘের তরেতে এ পথে রহিবে সদাই
যত না শঙ্কাভরে,

তার চেয়ে শত শঙ্কা আকুলহইবে যে তুমি,
বাপ-ভাইদের ডরে।
লোকালয়ে আর ফিরিতে পাবে না, বনের যত না
হিংস্র পশুর সনে,
দিনেরে ছাপায়ে, রাতের ছাপায়ে রহিতে হইবে
অতীব সঙ্গোপনে।
খুব ভাল করে ভেবে দেখ তুমি, এখনো রয়েছে
ফিরিবার বসর,
শুধু নিমিষের ভুলের লাগিয়া কাঁদিবে যে তুমি,
সারাটি জনমভর।

অনেক ভাবিয়া দেখেছি সোজন, তুমি যেথা রবে,
সকল জগতখানি
শত্রু হইয়া দাঁড়ায় যদিবা, আমি ত তাদেরে
তৃণসম নাহি মানি।
গহন বনেতে রাতের বেলায় যখন ডাকিবে
হিংস্র পশুর পাল,
তোমার অঙ্গে অঙ্গ জড়ায়ে রহিব যে আমি,
নীরবে সারাটি কাল।
পথে যেতে যেতে ক্লান্ত হইয়া এলায়ে পড়িবে
অলস এ দেহখানি,

ওই চাঁদমুখ হেরিয়া তখন শত উৎসাহ
বুকেতে আনিব টানি।
বৃষ্টির দিনে পথের কিনারে মাথার কেশেতে
রচিয়া কুটির খানি,
তোমারে তাহার মাঝেতে শোয়ারে সাজাব যে আমি
বনের কুসুম আনি।
ক্ষুধা পেলে তুমি উচু ডালে উঠি থোপায় থোপায়
পাড়িয়া আনিও ফল,
নল ভেঙে আমি জল খাওয়াইব, বন-পথে যেতে
যদি পায়ে লাগে ব্যথা,
গানের সুরেতে শুনাইবে আমি শ্রানি- নাশিতে
সে শিশুকালের কথা।
তুমি যেথা যাবে সেখানে বন্ধু! শিশু বয়সের
দিয়ে যত ভালবাসা,
বাবুই পাখির মত উচু ডালে অতি সযতনে
রচিব সুখের বাসা।
দূরের শব্দ নিকটে আসিছে, কথা কহিবার
আর অবসর নাই,
রাতের আঁধারে চল এই পথে, আমরা দুজনে
বন-ছায়ে মিশে যাই।

সাক্ষী থাকিও আল্লা-রসুল, সাক্ষী থাকিও
যত পীর আউলিয়া
এই হতভাগী বালিকারে আমি বিপদের পথে
চলিলাম আজি নিয়া।
সাক্ষী থাকিও চন্দ্র-সূর্য! সাক্ষী থাকিও
আকাশের যত তারা,
আজিকার এই গহন রাতের অন্ধকারেতে
হইলাম ঘরছাড়া।
সাক্ষী থাকিও খোদার আরশ, সাক্ষী থাকিও
নবীর কোরানখানি,
ঘর ছাড়াইয়া, বাড়ি ছাড়াইয়া কে আজ আমারে
কোথা লয়ে যায় টানি।
সাক্ষী থাকিও শিশূলতলীর যত লোকজন
যত ভাই-বোন সবে,
এ জনমে আর সোজনের সনে কভু কোনখানে
কারো নাহি দেখা হবে।
জনমের মত ছেড়ে চলে যাই শিশু বয়সের
শিমূলতলীর গ্রাম,
এখানেতে আর কোনদিন যেন নাহি কহে কহে
সোজন-দুলীর নাম।

পুর্ব্বরাগ

দীঘিতে তখনো শাপলা ফুলেরা হাসছিলো আনমনে,
টের পায়নিক পান্ডুর চাঁদ ঝুমিছে গগন কোণে ।
উদয় তারার আকাশ-প্রদীপ দুলিছে পুবের পথে,
ভোরের সারথী এখনো আসেনি রক্ত-ঘোড়ার রথে।
গোরস্থানের কবর খুঁড়িয়া মৃতেরা বাহির হয়ে,
সাবধান পদে ঘুরিছে ফিরিছে ঘুমন্ত লোকালয়ে।
মৃত জননীরা ছেলে মেয়েদের ঘরের দুয়ার ধরি,
দেখিছে তাদের জোনাকি আলোয় ক্ষুধাতুর আঁখি ভরি।
মরা শিশু তার ঘুমন্ত মার অধরেতে দিয়ে চুমো,
কাঁদিয়া কহিছে, "জনম দুখিনী মারে, তুই ঘুমো ঘুমো।"
ছোট ভাইটিরে কোলেতে তুলিয়া মৃত বোন কেঁদে হারা,
ধরার আঙনে সাজাবে না আর খেলাঘরটিরে তারা।

দুর মেঠো পথে প্রেতেরা চলেছে আলেয়ার আলো বলে,
বিলাপ করিছে শ্মশানের শব ডাকিনী যোগীনি লয়ে।
রহিয়া রহিয়া মড়ার খুলিতে বাতাস দিতেছে শীস,
সুরে সুরে তার শিহরি উঠিছে আঁধিয়ারা দশধিশ।
আকাশের নাটমঞ্চে নাচিছে অপ্সরী তারাদল,
দুগ্ধ ধবল ছায়াপথ দিয়ে উড়াইয়ে অঞ্চল।

কাল পরী আর নিদ্রা পরীরা পালঙ্ক লয়ে শিরে,
উড়িয়া চলেছে স্বপনপুরীর মধুবালা-মন্দিরে।

হেনকালে দুর গ্রামপথ হতে উঠিল আজান-গান ।
তালে তালে তার দুলিয়া উঠিল স্তব্ধএ ধরাখান।
কঠিন কঠোর আজানের ধবনি উঠিল গগন জুড়ে।
সুরেরে কে যেন উঁচু হতে আরো উঁচুতে দিতেছে ছুঁড়ে।
পুর্ব গগনে রক্ত বরণ দাঁড়াল পিশাচী এসে,
ধরণী ভরিয়া লহু উগারিয়া বিকট দশনে হেসে।
ডাক শুনি তার কবরে কবরে পালাল মৃতের দল,
শ্মাশানঘাটায় দৈত্য দানার থেমে গেল কোলাহল।
গগনের পথে সহসা নিবিল তারার প্রদীপ মালা
চাঁদ জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে গেল ভরি আকাশের থালা।

তখনো কঠোর আজান ধ্বনিছে, সাবধান সাবধান!
ভয়াল বিশাল প্রলয় বুঝিবা নিকটেতে আগুয়ান।
ওরে ঘুমন্ত-ওরে নিদ্রিত-ঘুমের বসন খোল,
ডাকাত আসিয়া ঘিরিয়াছে তোর বসত-বাড়ির টোল।
শয়ন-ঘরেতে বাসা বাঁধিয়াছে যত না সিঁধেল চোরে,
কণ্ঠ হইতে গজমতি হার নিয়ে যাবে চুরি করে।

শয়ন হইতে জাগিল সোজন, মনে হইতেছে তার
কোন অপরাধ করিয়াছে যেন জানে না সে সমাচার।
চাহিয়া দেখিল, চালের বাতায় ফেটেছে বাঁশের বাঁশী,
ইঁদুর আসিয়া থলি কেটে তার ছড়ায়েছে কড়িরাশি।
বার বার করে বাঁশীরে বকিল, ইদুরের দিল গালি,
বাঁশী ও ইঁদুর বুঝিল না মানে সেই তা শুনিল খালি।

তাড়াতাড়ি উঠি বাঁশীটি লইয়া দুলীদের বাড়ি বলি,
চলিল সে একা রাঙা প্রভাতের আঁকা-বাঁকা পথ দলি।
খেজুরের গাছে পেকেছে খেজুর, ঘনবন-ছায়া-তলে,
বেথুল ঝুলিছে বার বার করে দেখিল সে কুতুহলে।
ও-ই আগডালে পাকিয়াছে আম, ইসরে রঙের ছিরি,
এক্কে ঢিলেতে এখনি সে তাহা আনিবারে পারে ছিঁড়ি।
দুলীরে ডাকিয়া দেখাবে এসব, তারপর দুইজনে,
পাড়িয়া পাড়িয়া ভাগ বসাইবে ভুল করে গণে গণে।
এমনি করিয়া এটা ওটা দেখি বহুখানে দেরি করি,
দুলীদের বাড়ি এসে-পৌঁছিল খুশীতে পরাণ ভরি।
দুলী শোন্ এসে- একিরে এখনো ঘুমিয়ে যে রয়েছিস্?
ও পাড়ার লালু খেজুর পাড়িয়া নিয়ে গেলে দেখে নিস্!
সিঁদুরিয়া গাছে পাকিয়াছে আম, শীগগীর চলে আয়,
আর কেউ এসে পেড়ে যে নেবে না, কি করে বা বলা যায়।

এ খবর শুনে হুড়মুড় করে দুলী আসছিল ধেয়ে,
মা বলিল, এই ভর সক্কালে কোথা যাস্ ধাড়ী মেয়ে?
সাতটা শকুনে খেয়ে না কুলোয় আধেক বয়সী মাগী,
পাড়ার ধাঙড় ছেলেদের সনে আছেন খেলায় লাগি।
পোড়ারমুখীলো, তোর জন্যেতে পাড়ায় যে টেকা ভার,
চুন নাহি ধারি এমন লোকেরো কথা হয় শুনিবার!
এ সব গালির কি বুঝিবে দুলী, বলিল একটু হেসে,
কোথায় আমার বসয় হয়েছে, দেখই না কাছে এসে।
কালকে ত আমি সোজনের সাথে খেলাতে গেলাম বনে,
বয়স হয়েছে এ কথা ত তুমি বল নাই তক্ষণে।
এক রাতে বুঝি বয়স বাড়িল? মা তোমার আমি আর
মাথার উকুন বাছিয়া দিব না, বলে দিনু এইবার।
ইহা শুনি মার রাগের আগুন জ্বলিল যে গিঠে গিঠে,
গুড়ুম গুড়ুম তিন চার কিল মারিল দুলীর পিঠে।

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চাহিয়া সোজন দেখিল এ অবিচার,
কোন হাত নাই করিতে তাহার আজি এর প্রতিকার।
পায়ের উপরে পা ফেলিয়া পরে চলিল সমুখ পানে,
কোথায় চলেছে কোন পথ দিয়ে, এ খবর নাহি জানে।
দুই ধারে বন, লতায়-পাতায় পথেরে জড়াতে চায়,

গাছেরা উপরে ঝলর ধরেছে শাখা বাড়াইয়া বায়।
সম্মুখ দিয়া শুয়োর পালাল, ঘোড়েল ছুটিল দূরে,
শেয়ালের ছাও কাঁদন জুড়িল সারাটি বনানী জুড়ে।
একেলা সোজন কেবলি চলেছে কালো কুজঝটি পথ,
ভর-দুপুরেও নামে না সেথায় রবির চলার রথ।
সাপের ছেলম পায়ে জড়ায়েছে, মাকড়ের জাল শিরে,
রক্ত ঝরিছে বেতসের শীষে শরীরের চাম ছিঁড়ে।
কোন দিকে তার ভ্রুক্ষেপ নাই রায়ের দীঘির পাড়ে,
দাঁড়াল আসিয়া ঘন বেতঘেরা একটি ঝোপের ধারে।
এই রায়-দীঘি, ধাপ-দামে এর ঘিরিয়াছে কালো জল,
কলমি লতায় বাঁধিয়া রেখেছে কল-ঢেউ চঞ্চল।
চারধারে এর কর্দম মথি বুনো শুকরের রাশি,
শালুকের লোভে পদ্মের বন লুণ্ঠন করে আসি।
জল খেতে এসে গোখুরা সপেরা চিহ্ন এঁকেছে তীরে,
কোথাও গাছের শাখায় তাদের ছেলম রয়েছে ছিঁড়ে।
রাত্রে হেথায় আগুন জ্বালায় নর-পিশাচের দল,
মড়ার মাথায় শিস দিয়ে দিয়ে করে বন চঞ্চল।
রায়েদের বউ গলবন্ধনে মরেছিল যার শাখে,
সেই নিমগাছ ঝুলিয়া পড়িয়া আজো যেন কারে ডাকে!

এইখানে এসে মিছে ঢিল ছুঁড়ে নাড়িল দীঘির জল,

গাছেরে ধরিয়া ঝাঁকিল খানিক, ছিঁড়িল পদ্মদল।
তারপর শেষে বসিল আসিয়া নিমগাছটির ধারে,
বসে বসে কি যে ভাবিতে লাগিল, সেই তা বলিতে পারে।

পিছন হইতে হঠাৎ আসিয়া কে তাহার চোখ ধরি,
চুড়ি বাজাইয়া কহিল, কে আমি বল দেখি ঠিক করি?
ও পাড়ার সেই হারানের পোলা। ইস শোন বলি তবে
নবীনের বোন বাতাসী কিম্বা উল্লাসী তুমি হবেই হবে!
পোড়ামুখীরা এমনি মরুক- আহা, আহা বড় লাগে,
কোথাকার এই ব্রক্ষদৈত্য কপালে চিমটি দাগে।
হয়েছে হয়েছে, বিপিনের খুড়ো মরিল যে গত মাসে,
সেই আসিয়াছে, দোহাই! দোহাই! বাঁচি না যে খুড়ো ত্রাসে!
“ভারি ত সাহস!” এই বলে দুলী খিল্ খিল্ করে হাসি,
হাত খুলে নিয়ে সোজনের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল আসি।
একি তুই দুলী! বুঝিবা সোজন পড়িল আকাশ হতে,
চাপা হাসি তার ঠোঁটের বাঁধন মানে না যে কোনমতে।
দুলী কহে, দেখ! তুই ত আসিলি, মা তখন মোরে কয়,
বয়স বুঝিয়া লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে হয়।
ও পাড়ার খেঁদি পাড়ারমুখীরে ঝেঁটিয়ে করিতে হয়।
আর জগাপিসী, মায়ের নিকটে যা তা বলিয়াছে তারা।
বয়স হয়েছে আমাদের থেকে ওরাই জানিল আগে,

ইচ্ছে যে করে উহাদের মুখে হাতা পুড়াইয়া দাগে।
আচ্ছা সোজন! সত্যি করেই বয়স যদিবা হত,
আর কেউ তাহা জানিতে পারিত এই আমাদের মত?
ঘাড় ঘুরাইয়া কহিল সোজন, আমি ত ভেবে না পাই,
আজকে হঠাৎ বয়স আসিল? আসিলই যদি শেষে,
কথা কহিল না, অবাক কান্ড, দেখি নাই কোনো দেশে।

দুলালী কহিল, আচ্ছা সোজন, বল দেখি তুই মোরে,
বয়স কেমন! কোথায় সে থাকে! আসে বা কেমন করে!
তাও না জানিস! সোজন কহিল, পাকা চুল ফুরফুরে,
লাঠি ভর দিয়ে চলে পথে পথে বুড়ো সে যে থুরথুরে।
দেখ দেখি ভাই, মিছে বলিসনে, আমার মাথার চুলে,
সেই বুড়ো আজ পাকাচুল লয়ে আসে নাইতরে ভুলে?
দুলীর মাথার বেণীটি খুলিয়া সবগুলো চুল ঝেড়ে,
অনেক করিয়া খুঁজিল সোজন, বুড়োনি সেথায় ফেরে!
দুলীর মুখ ত সাদা হয়ে গেছে, যদি বা সোজন বলে,
বয়স আজিকে এসেছে তাহার মাথার কেশেতে চলে!
বহুখন খুঁজি কহিল সোজন-নারে না, কোথাও নাই,
তোর চুলে সেই বয়স-বুড়োর চিহ্ন না খুঁজে পাই!
দুলালী কহিল, এক্ষুণি আমি জেনে আসি মার কাছে
আমার চুলেতে বয়সের দাগ কোথা আজি লাগিয়াছে।

দুলী যেন চলে যায়ই আর কি, সোজন কহিল তারে,
এক্ষুণি যাবি? আয় না একটু খেলিগে বনের ধারে।

বউ-কথা কও গাছের উপরে ডাকছিল বৌ-পাখি,
সোজন তাহারে রাগাইয়া দিল তার মত ডাকি ডাকি।
দুলীর তেমনি ডাকিতে বাসনা, মুখে না বাহির হয়,
সোজনেরে বলে, শেখা না কি করে বউ কথা কও কয়?
দুলীর দুখানা ঠোঁটেরে বাঁকায়ে খুব গোল করে ধরে,
বলে, এইবার শিস দে ত দেখি পাখির মতন স্বরে।
দুলীর যতই ভুল হয়ে যায় সোজন ততই রাগে,
হাসিয়া তখনদুলীর দুঠোট ভেঙে যায় হেন লাগে।

ধ্যেৎ বোকা মেয়ে, এই পারলি নে, জীভটা এমনি করে,
ঠোটের নীচেতে বাঁকালেই তুই ডাকিবি পাখির স্বরে।
এক একবার দুলালী যখন পাখির মতই ডাকে,
সোজনের সেকি খুশী, মোরা কেউ হেন দেখি নাই তাকে।
দেখ, তুই যদি আর একটুকু ডাকিতে পারিস ভালো,
কাল তোর ভাগে যত পাকা জাম হবে সব চেয়ে কালো।
বাঁশের পাতার সাতখানা নথ গড়াইয়া দেব তোরে,
লাল কুঁচ দেব খুব বড় মালা গাঁথিস যতন করে!
দুলী কয়, তোর মুখ ভরা গান, দে না মোর মুখে ভরে,

এই আমি ঠোঁট খুলে ধরিলাম দম যে বন্ধ করে।
দাঁড়া তবে তুই, বলিয়া সোজন মুখ বাড়ায়েছে যবে,
দুলীর মাতা যে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল কলরবে।
ওরে ধাড়ী মেয়ে, সাপে বাঘে কেন খায় না ধরিয়া তোরে?
এতকাল আমি ডাইনি পুষেছি আপন জঠরে ধরে!
দাঁড়াও সোজন! আজকেই আমি তোমার বাপেরে ডাকি,
শুধাইব, এই বেহায়া ছেলের শাসি- সে দেবে নাকি?

এই কথা বলে দুলালীরে সে যে কিল থাপ্পড় মারি,
টানিতে টানিতে বুনো পথ বেয়ে ছুটিল আপন বাড়ি।
একলা সোজন বসিয়া রহিল পাথরের মত হায়,
ভাবিবারও আজ মনের মতন ভাষা সে খুঁজে না পায়?

বেদের বহর

মধুমতী নদী দিয়া,
বেদের বহর ভাসিয়া চলেছে কূলে ঢেউ আছাড়িয়া।
জলের উপরে ভাসাইয়া তারা ঘরবাড়ি সংসার,
নিজেরাও আজ ভাসিয়া চলেছে সঙ্গ লইয়া তার।
মাটির ছেলেরা অভিমান করে ছাড়িয়া মায়ের কোল,
নাম-হীন কত নদী-তরঙ্গে ফিরিছে খাইয়া দোল।

দুপাশে বাড়ায়ে বাঁকা তট-বাহু সাথে সাথে মাটি ধায়,
চঞ্চল ছেলে আজিও তাহারে ধরা নাহি দিল হায়।
কত বন পথ সুশীতল ছায়া ফুল-ফল-ভরা গ্রাম,
শস্যের খেত আলপনা আঁকি ডাকে তারে অবিরাম!
কত ধল-দীঘি গাজনের হাট, রাঙা মাটি পথে ওড়ে,
কারো মোহে ওরা ফিরিয়া এলো না আবার মাটির ঘরে।
জলের উপরে ভাসায়ে উহারা ডিঙ্গী নায়ের পাড়া,
নদীতে নদীতে ঘুরিছে ফিরিছে সীমাহীন গতিধারা।
তারি সাথে সাথে ভাসিয়া চলেছে প্রেম ভালবাসা মায়া,
চলেছে ভাসিয়া সোহাগ, আদর ধরিয়া ওদের ছায়া।
জলের উপরে ভাসাইয়া তারা ঘরবাড়ি সংসার,
ত্যাগের মহিমা, পুন্যের জয় সঙ্গে চলেছে তার।

সামনের নায়ে বউটি দাঁড়ায়ে হাল ঘুরাইছে জোরে,
রঙিন পালের বাদাম তাহার বাতাসে গিয়াছে ভরে।
ছই এর নীচে স্বামী বসে বসে লাঠিতে তুলিছে ফুল,
মুখেতে আসিয়া উড়িছে তাহার মাথায় বাবরী চুল।
ও নায়ের মাঝে বউটিরে ধরে মারিতেছে তার পতি,
পাশের নায়েতে তাস খেলাইতেছে সুখে দুই দম্পতি।
এ নায়ে বেঁধেছে কুরুক্ষেত্র বউ-শাশুড়ীর রণে,
ও নায়ে স্বামীটি কানে কানে কথা কহিছে জায়ার সনে!
ডাক ডাকিতেছে, ঘুঘু ডাকিতেছে, কোড়া করিতেছে রব,
হাট যেন জলে ভাসিয়া চলেছে মিলি কোলাহল সব।
জলের উপরে কেবা একখানা নতুন জগৎ গড়ে,
টানিয়া ফিরিছে যেথায় সেথায় মনের খুশীর ভরে।

কোন কোন নায়ে রোদে শুখাইছে ছেঁড়া কাঁথা কয়খানা,
আর কোন নায়ে শাড়ী উড়িতেছে বরণ দোলায়ে নানা।
ও নাও হইতে শুটকি মাছের গন্ধ আসিছে ভাসি,
এ নায়ের বধূ সুন্দা ও মেথি বাঁটিতেছে হাসি হাসি।
কোনখানে ওরা সি'র নাহি রহে জ্বালাতে সন্ধ্যাদীপ,
একঘাট হতে আর ঘাটে যেয়ে দোলায় সোনার টীপ।

এদের গাঁয়ের কোন নাম নাই, চারি সীমা নাহি তার,
উপরে আকাশ, নীচে জলধারা, শেষ নাহি কোথা কার।
পড়শী ওদের সূর্য, তারকা, গ্রহ ও চন্দ্র আদি,
তাহাদের সাথে ভাব করে ওরা চলিয়াছে দল বাঁধি,
জলের হাঙর-জলের কুমীর- জলের মাছের সনে,
রাতের বেলায় ঘুমায় উহারা ডিঙ্গী-নায়ের কোণে।

বেদের বহর ভাসিয়া চলেছে মধুমতী নদী দিয়া,
বেলোয়ারী চুড়ি, রঙিন খেলনা, চিনের সিদুর নিয়া।
ময়ূরের পাখা, ঝিনুকের মতি, নানান পুতিঁর মালা,
তরীতে তরীতে সাজান রয়েছে ভরিয়া বেদের ডালা।
নায়ে নায়ে ডাকে মোরগ-মুরগী যত পাখি পোষ-মানা,
শিকারী কুকুর রহিয়াছে বাঁধা আর ছাগলের ছানা।
এ নায়ে কাঁদিছে শিশু মার কোলে- এ নায়ে চালার তলে,
গুটি তিনচার ছেলেমেয়ে মিলি খেলা করে কৌতুহলে।

বেদের বহর ভাসিয়া চলেছে, ছেলেরা দাঁড়ায়ে তীরে,
অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিছে জলের এ ধরণীরে!
হাত বাড়াইয়া কেহ বা ডাকিছে- কেহ বা ছড়ার সুরে,
দুইখানি তীর মুখর করিয়া নাচিতেছে ঘুরে ঘুরে।
চলিল বেদের নাও,

কাজল কুঠির বন্দর ছাড়ি ধরিল উজানী গাঁও।
গোদাগাড়ী তারা পারাইয়া গেল, পারাইল বউঘাটা,
লোহাজুড়ি গাঁও দক্ষিণে ফেলি আসিল দরমাহাটা।
তারপর আসি নাও লাগাইল উড়ানখালির চরে,
রাতের আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে তখন মাথার পরে।

ধীরে অতি ধীরে প্রতি নাও হতে নিবিল প্রদীপগুলি,
মৃদু হতে আরো মৃদুতর হল কোলাহল ঘুমে ঢুলি!
কাঁচা বয়সের বেদে-বেদেনীর ফিস ফিস কথা কওয়া,
এ নায়ে ওনায়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শুনিছে রাতের হাওয়া।
তাহাও এখন থামিয়া গিয়াছে, চাঁদের কলসী ভরে,
জোছনার জল গড়ায়ে পড়িছে সকল ধরণী পরে।
আকাশের পটে এখানে সেখানে আবছা মেঘের রাশি,
চাঁদের আলোরে মাজিয়া মাজিয়া চলেছে বাতাসে ভাসি।
দূর গাঁও হতে রহিয়া রহিয়া ডাকে পিউ, পিউ কাঁহা,
যোজন যোজন আকাশ ধরায় রচিয়া সুরের রাহা।

এমন সময় বেদে-নাও হতে বাজিয়া বাঁশের বাঁশী,
সারা বালুচরে গড়াগড়ি দিয়ে বাতাসে চলিল ভাসি,
কতক তাহার নদীতে লুটাল, কতক বাতাস বেয়ে,
জোছনার রথে সোয়ার হইয়া মেঘেতে লাগিল যেয়ে।

সেই সুর যেন সারে জাহানের দুঃসহ ব্যথা-ভার,
খোদার আরশ কুরছি ধরিয়া কেঁদে ফেরে বারবার।

বেদের বেসাতি

প্রভাত না হতে সারা গাঁওখানি
কিল বিল করি ভরিল বেদের দলে,
বেলোয়ারী চুড়ি চিনের সিদুর,
রঙিন খেলনা হাঁকিয়া হাঁকিয়া চলে।
ছোট ছোট ছেলে আর যত মেয়ে
আগে পিছে ধায় আড়াআড়ি করি ডাকে,
এ বলে এ বাড়ি, সে বলে ও বাড়ি,
ঘিরিয়াছে যেন মধুর মাছির চাকে।
কেউ কিনিয়াছে নতুন ঝাঁজর,
সবারে দেখায়ে গুমরে ফেলায় পা;
কাঁচা পিতলের নোলক পরিয়া,
ছোট মেয়েটির সোহাগ যে ধরে না।
দিদির আঁচল জড়ায়ে ধরিয়া
ছোট ভাই তার কাঁদিয়া কাটিয়া কয়,
"তুই চুড়ি নিলি আর মোর হাত
খালি রবে বুঝি ? কক্ষনো হবে নয়।"
"বেটা ছেলে বুঝি চুড়ি পরে কেউ ?
তার চেয়ে আয় ডালিমের ফুল ছিঁড়ে.
কাঁচা গাব ছেঁচে আঠা জড়াইয়া

ঘরে বসে তোর সাজাই কপালটিরে।”
দস্যি ছেলে সে মানে না বারণ,
বেদেনীরে দিয়ে তিন তিন সের ধান,
কি ছাতার এক টিন দিয়ে গড়া
বাঁশী কিনে তার রাখিতে যে হয় মান।
মেঝো বউ আজ গুমর করেছে,
শাশুড়ী কিনেছে ছোট ননদীর চুড়ি,
বড় বউ ডালে ফোড়ৎ যে দিতে
মিছেমিছি দেয় লঙ্কা-মরিচ ছুঁড়ি।
সেজো বউ তার হাতের কাঁকন
ভাঙিয়া ফেলেছে ঝাড়িতে ঝাড়িতে ধান,
মন কসাকসি, দর কসাকসি
করিয়া বৃদ্ধা শাশুড়ী যে লবেজান।

এমনি করিয়া পাড়ায় পাড়ায়
মিলন-কলহ জাগাইয়া ঘরে ঘরে,
চলে পথে পথে বেদে দলে দলে
কোলাহলে গাঁও ওলট পালট করে।
ইলি মিলি কিলি কথা কয় তারা
রঙ-বেরঙের বসন উড়ায়ে বায়ে,
ইন্দ্রজেলের জালখানি যেন

বেয়ে যায় তারা গাঁও হতে আর গাঁয়ে।
এ বাড়ি-ও বাড়ি-সে বাড়ি ছাড়িতে
হেলাভরে তারা ছড়াইয়া যেন চলে,
হাতে হাতে চুড়ি, কপালে সিঁদুর,
কানে কানে দুল, পুঁতির মালা যে গলে।
নাকে নাক-ছাবি, পায়েতে ঝাঁজর-
ঘরে ঘরে যেন জাগায়ে মহোৎসব,
গ্রাম-পথখানি রঙিন করিয়া
চলে হেলে দুলে, বেদে-বেদেনীরা সব।

"দুপুর বেলায় কে এলো বাদিয়া
দুপুরের রোদে নাহিয়া ঘামের জলে,
ননদীলো, তারে ডেকে নিয়ে আয়,
বসিবারে বল কদম গাছের তলে।"
"কদমের ডাল ফোটা ফুল-ভারে
হেলিয়া পড়েছে সারাটি হালট ভরে।"
"ননদীলো, তারে ডেকে নিয়ে আয়,
বসিবার বল বড় মন্টব ঘরে।"
"মন্টব ঘরে মস্ত যে মেঝে
এখানে সেখানে ইঁদুরে তুলেছে মাটি।"
"ননদীলো", তারে বসিবারে বল

উঠানের ধারে বিছায়ে শীতলপাটী।”
“শোন, শোন ওহে নতুন বাদিয়া,
রঙিন ঝাঁপির ঢাকনি খুলিয়া দাও,
দেখাও, দেখাও মনের মতন
সুতা সিন্দুর তুমি কি আনিয়াছাও।
দেশাল সিঁদুর চাইনাক আমি
কোটায় ভরা চিনের সিঁদুর চাই,
দেশাল সিঁদুর খস্ খস্ করে,
সীথায় পরিয়া কোন সুখ নাহি পাই।

দেশাল সোন্দা নাহি চাহি আমি
গায়ে মাখিবার দেশাল মেথি না চাহি,
দেশাল সোন্দা মেখে মেখে আমি
গরম ছুটিয়া ঘামজলে অবগাহি।”
“তোমার লাগিয়া এনেছি কন্যা,
রাম-লক্ষ্মণ দুগাছি হাতের শাঁখা,
চীন দেশ হতে এনেছি সিঁদুর
তোমার রঙিন মুখের মমতা মাখা।”
“কি দাম তোমার রাম-লক্ষ্মণ
শঙ্খের লাগে, সিঁদুরে কি দাম লাগে,
বেগানা দেশের নতুন বাদিয়া

সত্য করিয়া কহগো আমার আগে।”

“আমার শাঁখার কোন দাম নাই,
ওই দুটি হাতে পরাইয়া দিব বলে,
বাদিয়ার ঝালি মাথায় লইয়া
দেশে দেশে ফিরি কাঁদিয়া নয়ন-জলে।
সিঁদুর আমার ধন্য হইবে,
ওই ভালে যদি পরাইয়া দিতে পারি,
বিগানা দেশের বাদিয়ার লাগি
এতটুকু দয়া কর তুমি ভিন-নারী।”
“ননদীলো, তুই উঠান হইতে
চলে যেতে বল বিদেশী এ বাদিয়ারে।
আর বলে দেলো, ওসব দিয়ে সে
সাজায় যেন গো আপনার অবলারে।”
“কাজল বরণ কন্যালো তুমি,
ভিন-দেশী আমি, মোর কথা নাহি ধর,
যাহা মনে লয় দিও দাম পরে
আগে তুমি মোর শাঁখা-সিঁদুর পর।”

“বিদেশী বাদিয়া নায়ে সাথে থাক,
পসরা লইয়া ফের তুমি দেশে দেশে।

এ কেমন শাঁখা পরাইছ মোরে,
কাদিঁয়া কাঁদিয়া নয়নের জলে ভেসে?
সীথায় সিঁদুর পরাইতে তুমি,
সিঁদুরের গুঁড়ো ভিজালে চোখের জলে।
ননদীলো, তুই একটু ওধারে
ঘুরে আয়, আমি শুনে আসি, ও কি বলে।”
“কাজল বরণ কণ্যালো তুমি,
আর কোন কথা শুধায়ো না আজ মোরে,
সোঁতের শেহলা হইয়া যে আমি
দেশে দেশে ফিরি, কি হবে খবর করে।
নাহি মাতা আর নাহি পিতা মোর
আপন বলিতে নাহি বান্ধব জন,
চলি দেশে দেশে পসরা বহিয়া
সাথে সাথে চলে বুক-ভরা ক্রদন।
সুখে থাক তুমি, সুখে থাক মেয়ে-
সীথায় তোমার হাসে সিঁদুরের হাসি,
পরাণ তোমর ভরুক লইয়া,
স্বামীর সোহাগ আর ভালবাসাবাসি।”

“কে তুমি, কে তুমি ? সোজন ! সোজন!
যাও-যাও-তুমি। এক্ষুণি চলে যাও।

আর কোনদিন ভ্রমেও কখনো
উড়ানখালীতে বাড়ায়ো না তব পাও।
ভুলে গেছি আমি, সব ভুলে গেছি
সোজন বলিয়া কে ছিল কোথায় কবে,
ভ্রমেও কখনো মনের কিনারে
অনিনাক তারে আজিকার এই ভবে।
এই খুলে দিনু শঙ্খ তোমার
কৌটায় ভরা সিন্দুর নিয়ে যাও,
কালকে সকালে নাহি দেখি যেন
কুমার নদীতে তোমার বেদের নাও।”

“দুলী-দুলী-তুমি এও পার আজ !
বুক-খুলে দেখ, শুধু ক্ষত আর ক্ষত,
এতটুকু ঠাঁই পাবেনাক সেথা
একটি নখের আঁচড় দেবার মত।”

“সে-সব জানিয়া মোর কিবা হবে ?
এমন আলাপ পর-পুরুষের সনে,
যেবা নারী করে, শত বৎসর
জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে নরকের কোণে।
যাও-তুমি যাও এখনি চলিয়া

তব সনে মোর আছিল যে পরিচয়,
এ খবর যেন জগতের আর
কখনো কোথাও কেহ নাহি জানি লয়।”
“কেহ জানিবে না, মোর এ হিয়ার
চির কুহেলিয়া গহন বনের তলে,
সে সব যে আমি লুকায়ে রেখেছি
জিয়ায়ে দুখের শাঙনের মেঘ-জলে।
তুমি শুধু ওই শাঁখা সিন্দুর
হাসিমুখে আজ অঙ্গে পরিয়া যাও।
জনমের শেষ চলে যাই আমি
গাঙে ভাসাইয়া আমার বেদের নাও।”
“এই আশা লয়ে আসিয়াছ তুমি,
ভাবিয়াছ, আমি কুলটা নারীর পারা,
তোমার হাতের শাঁখা-সিন্দুরে
মজাইব মোর স্বাসীর বংশধারা ?”
“দুলী ! দুলী ! মোরে আরো ব্যথা দাও-
কঠিন আঘাত-দাও-দাও আরো-আরো,
ভেঙ্গে যাক বুক-ভেঙে যাক মন,
আকাশ হইতে বাজেরে আনিয়া ছাড়।
তোমারি লাগিয়া স্বজন ছাড়িয়া
ভাই বান্ধব ছাড়ি মাতাপিতা মোর,

বনের পশুর সঙ্গে ফিরেছি
লুকায়ে রয়েছি খুঁড়িয়া মড়ার গোর।
তোমারি লাগিয়া দশের সামনে
আপনার ঘাড়ে লয়ে সব অপরাধ,
সাতটি বছর কঠিন জেলের
ঘানি টানিলাম না করিয়া প্রতিবাদ।”

“যাও-তুমি যাও, ও সব বলিয়া
কেন মিছেমিছি চাহ মোরে ভুলাইতে,
আসমান-সম পতির গরব,
আসিও না তাহে এতটুকু কালি দিতে।
সেদিনের কথা ভুলে গেছি আমি,
একটু দাঁড়াও ভাল কথা হল মনে-
তুমি দিয়েছিলে বাঁক-খাড়ু পার,
নথ দিয়েছিলে পরিতে নাকের সনে।
এতদিনও তাহা রেখেছিনু আমি
কপালের জোরে দেখা যদি হল আজ,
ফিরাইয়া তবে নিয়ে যাও তুমি-
দিয়েছিলে মোরে অতীতের যত সাজ।

আর এক কথা-তোমার গলায়

গামছায় আমি দিয়েছিনু আঁকি ফুল,
সে গামছা মোর ফিরাইয়া দিও,
লোকে দেখে যদি, করিবারে পারে ভুল।
গোড়ায়ের ধারে যেখানে আমরা
বাঁধিয়াছিলাম দুইজনে ছোট ঘর,
মোদের সে গত জীবনের ছবি,
আঁকিয়াছিলাম তাহার বেড়ার পর।
সেই সব ছবি আজো যদি থাকে,
আর তুমি যদি যাও কভু সেই দেশে ;
সব ছবিগুলি মুছিয়া ফেলিবে,
মিথ্যা রটাতে পারে কেহ দেখে এসে।
সবই যদি আজ ভুলিয়া গিয়াছি,
কি হবে রাখিয়া অতীতের সব চিন,
স্মরণের পথে এসে মাঝে মাঝে-
জীবনেরে এরা করিবারে পারে হীন ।”

“দুলী, দুলী, তুমি ! এমনি নিঠুর !
ইহা ছাড়া আর কোন কথা বলে মোরে-
জীবনের এই শেষ সীমানায়
দিতে পারিতে না আজিকে বিদায় করে?
ভুলে যে গিয়েছ, ভালই করেছ, –

আমার দুখের এতটুকু ভাগী হয়ে,
জনমের শেষ বিদায় করিতে
পারিতে না মোরে দুটি ভাল কথা কয়ে ?
আমি ত কিছুই চাহিতে আসিনি!
আকাশ হইতে যার শিরে বাজ পড়ে,
তুমি ত মানুষ, দেবের সাধ্য,
আছে কি তাহার এতটুকু কিছু করে ?
ললাটের লেখা বহিয়া যে আমি
সায়রে ভাসিনু আপন করম লায়ে ;
তারে এত ব্যথা দিয়ে আজি তুমি
কি সুখ পাইলে, যাও-যাও মোরে কয়ে।
কি করেছি আমি, সেই অন্যায়
তোমার জীবনে কি এমন ঘোরতর।
মরা কাষ্টেতে আগুন ফুঁকিয়া-
কি সুখেতে বল হাসে তব অন্তর ?
দুলী ! দুলী ! দুলী ! বল তুমি মোরে,
কি লইয়া আজ ফিরে যাব শেষদিনে।
এমনি নিঠুর স্বার্থ পরের
রুপ দিয়ে হায় তোমারে লইয়া চিনে ?
এই জীবনেরো আসিবে সেদিন
মাটির ধরায় শেষ নিশ্বাস ছাড়ি,

চিরবন্দী এ খাঁচার পাখিটি
পালাইয়া যাবে শুণ্যে মেলিয়া পাড়ি।
সে সময় মোর কি করে কাটিবে,
মনে হবে যবে সারটি জনম হায়
কঠিন কঠোর মিথ্যার পাছে
ঘুরিয়া ঘুরিয়া খোয়ায়েছি আপনায়।
হায়, হায়, আমি তোমারে খুঁজিয়া
বাদিয়ার বেশে কেন ভাসিলাম জলে,
কেন তরী মোর ডুবিয়া গেল না
ঝড়িয়া রাতের তরঙ্গ হিল্লোলে ?
কেন বা তোমারে খুঁজিয়া পাইনু,
এ জীবনে যদি ব্যথার নাহিক শেষ
পথ কেন মোর ফুরাইয়া গেল
নাহি পৌঁছিতে মরণের কালো দেশ।

পীর-আউলিয়া, কে আছ কোথায়
তারে দিব আমি সকল সালাম ভার,
যাহার আশীষে ভুলে যেতে পারি
সকল ঘটনা আজিকার দিনটার।
এ জীবনে কত করিয়াছি ভুল।
এমন হয় না ? সে ভুলের পথ পরে,

আজিকার দিন তেমনি করিয়া
চলে যায় চির ভুল ভরা পথ ধরে।
দুলী-দুলী আমি সব ভুলে যাব
কোন অপরাধ রাখিব না মনে প্রাণে ;
এই বর দাও, ভাবিবারে পারি
তব সন্ধান মেলে নাই কোনখানে।
ভাটীয়াল সোঁতে পাল তুলে দিয়ে
আবার ভাসিবে মোর বাদিয়ার তরী,
যাবে দেশে দেশে ঘাট হতে ঘাটে,
ফিরিবে সে একা দুলীর তালাশ করি।
বনের পাখিরে ডাকি সে শুধাবে,
কোন দেশে আছে সোনার দুলীর ঘরম,
দুরের আকাশ সুদুরে মিলাবে
আয়নার মত সাদা সে জলের পর।
চির একাকীয়া সেই নদী পথ,
সরু জল রেখা থামে নাই কোনখানে ;
তাহারি উপরে ভাসিবে আমার
বিরহী বাদিয়া, বন্ধুর সন্ধানে।
হায়, হায় আজ কেন দেখা হল
কেন হল পুন তব সনে পরিচয় ?
একটি ক্ষণের ঘটনা চলিল

সারাটি জনম করিবারে বিষময় ।'

"নিজের কথাই ভাবিলে সোজন,
মোর কথা আজ ? না-না- কাজ নাই বলে
সকলি যখন শেষ করিয়াছি-
কি হইবে আর পুরান সে কাদা ডলে।
ওই বুঝি মোর স্বামী এলো ঘরে,
এক্ষুনি তুমি চলে যাও নিজ পথে,
তোমাতে-আমাতে ছিল পরিচয়-
ইহা যেন কেহ নাহি জানে কোনমতে।
আর যদি পার, আশিস করিও
আমার স্বামীর সোহাগ আদর দিয়ে,
এমনি করিয়া মুছে ফেলি যেন,
যে সব কাহিনী তোমারে আমারে নিয়ে ।"
"যেয়ো না-যেয়ো না শুধু একবার
আঁখি ফিরাইয়া দেখে যাও মোর পানে,
আগুন জ্বেলেছ যে গহন বনে,
সে পুড়িছে আজ কি ব্যথা লইয়া প্রাণে?

ধরায় লুটায়ে কাঁদিল সোজন,
কেউ ফিরিল না, মুছাতে তাহার দুখ ;

কোন সে সুধার সায়রে নাহিয়া
জুড়াবে সে তার অনল পোড়া এ বুক ?
জ্বলে তার জ্বালা খর দুপুরের
রবি-রশ্মির তীব্র নিশাস ছাড়ি,
জ্বলে-জ্বলে জ্বালা কারবালা পথে,
দমকা বাতাসে তপ্ত বালুকা নাড়ি।
জ্বলে-জ্বলে জ্বালা খর অশনীর
ঘোর গরজনে পিঙ্গল মেঘে মেঘে,
জ্বলে-জ্বলে জ্বালা মহাজলধীর
জঠরে জঠরে ক্ষিপ্ত ঊর্মি বেগে।
জ্বলে-জ্বলে জ্বালা গিরিকন্দরে
শ্মশানে শ্মশানে জ্বলে জ্বালা চিতাভরে ;
তার চেয়ে জ্বালা-জ্বলে জ্বলে জ্বলে
হতাশ বুকের মথিত নিশাস পরে ।

জ্বালা-জ্বলে জ্বালা শত শিখা মেলি,
পোড়ে জলবায়ু-পোড়ে প্রান্তর-বন ;
আরো জ্বলে জ্বালা শত রবি সম,
দাহ করে শুধু পোড়ায় না তবু মন।
পোড়ে ভালবাসা-পোড়ে পরিণয়
পোড়ে জাতিকুল-পোড়ে দেহ আশা ভাষা,

পুড়িয়া পুড়িয়া বেঁচে থাকে মন,
সাক্ষী হইয়া চিতায় বাঁধিয়া বাসা।
জ্বলে-জ্বলে জ্বালা-হতাশ বুকের
দীর্ঘনিশাস রহিয়া রহিয়া জ্বলে ;
জড়ায়ে জড়ায়ে বেঘুম রাতের
সীমারেখাহীন আন্ধার অঞ্চলে।
হায়-হায়-সে যে কিজ দিয়ে নিবাবে
কারে দেখাইবে কাহারে কহিবে ডাকি,
বুক ভরি তার কি অনল জ্বালা
শত শিখা মেলি জ্বলিতেছে থাকি থাকি।
অনেক কষ্টে মাথার পসরা
মাথায় লইয়া টলিতে টলিতে হায়,
চলিল সোজন সমুখের পানে
চরণ ফেলিয়া বাঁকা বন-পথ ছায়।